ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৯

সেলিনা হোসেনের ছোটগল্প: নর-নারী সম্পর্ক

*নাজিয়া আফরিন

সারসংক্ষেপ : মানব সৃষ্টির রহস্যের মূলে রয়েছে নর-নারীর শারীরিক সম্পর্ক। পৃথিবী এত সুন্দর অথবা এত জটিল হয়ে ওঠার জন্য যে বিষয়টি সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য এবং গুরুত্ব বহন করে তা হলো এই নর-নারী। নরের অংশ নরের এবং নারীর অংশ নারীর। নরের প্রাপ্যও নরের নারীর প্রাপ্যও নারীর। এই সহজ সত্যটুকু যদি সহজভাবে জীবনকে সরল রেখায় চালিত করতে পারতো, তাহলে হয়তো আজকের সমাজে আর নারীবাদ পুরুষবাদ নিয়ে এতো বাক-বিতণ্ডার আবশ্যক হতো না। কিন্তু জীবন কখনো সরল রেখায় চলায় আনন্দ পায় না। তাইতো নারী-পুরুষের সম্মিলনে তৈরি হয়েছে আরেকটি জটিল চক্র। যে চক্রে আছে পাওয়া, না পাওয়া, আছে হতাশা, তিক্ততা আবার আছে একটুখানি পাওয়ার আনন্দে সকল দুঃখ কষ্ট আর গ্লানি ভুলে যাওয়ার তৃপ্তি। এসকল তাত্ত্বিক, দার্শনিক বা অভিজ্ঞতার কথা সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পের অলংকার। আর এসব অলংকারের যথার্থ বিন্যস্ত করে পাঠকের জন্য পসরা সাজানো হয়েছে এ অধ্যায়ে। কার্ল মার্ক্স এর নর-নারী সম্পর্কের সূত্র ব্যাখ্যায় অনুপ্রাণিত সেলিনা হোসেন তাঁর গল্প নির্মাণে সর্বাধিক মনোযোগ নিবিষ্ট করেছেন নর-নারীর চরিত্র বিশ্লেষণে। জীবনের গোলক ধাঁধায় পড়ে সম্পর্কগুলো কীভাবে খাবি খাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে আক্রোশ আর স্বার্থের চোরাবালিতে তা সেলিনা হোসেন নিবিড় পর্যবেক্ষণ থেকে তুলে ধরেছেন। এ প্রবন্ধে নর-নারী সবচেয়ে জটিল এবং পাক খাওয়া জীবনের সন্ধান পাওয়া যায়। সম্পর্কের সূত্রে নর এবং নারীর ভূমিকার নিরাসক্ত বর্ণনা রয়েছে সেলিনা হোসেনের প্রায় অধিকাংশ গল্পে। স্বার্থের মোহে নর-নারীর সবচেয়ে আকর্ষিত সম্পর্কেও চলে টানাপোড়েন। মধুরতা, তিক্ততার বয়ানে সেলিনা হোসেন প্রতিটি নর-নারীর চরিত্রকেই দিয়েছেন সজীবতা। নারী সর্বাধিক জটিলতার মুখোমুখি হয় পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে। এ জটিলতার পাক থেকে পাঠককে মুক্তি দিয়েছেন সেলিনা হোসেন। সেলিনা হোসেনের সেই বিশ্লেষণী নিবিড় পর্যবেক্ষণ পাঠকের সামনে তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে এ প্রবন্ধে।

মানুষ সমাজবদ্ধ জীব। শ্রেষ্ঠ জীব হিসেবে তার পক্ষে অনেক কিছুই করা সম্ভব। সেই সম্ভবের মধ্যে কারো কারো ইচ্ছা একা থাকা। সেই একা থাকা অবশ্য ক্ষণকালের জন্য। আমাদের আদি পুরুষ হযরত আদম (আ.) কে সৃষ্টি করে বেহেশতে থাকতে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু বেহেশতের অমৃত সুধা আর সুখ বিলাসিতার মধ্যে থেকেও তিনি একা থাকতে পারেননি। তার একাকীত্ব ঘোচানোর জন্য হযরত হাওয়া (আ.) কে সৃষ্টি করা হয়। সুতরাং বুঝা যায় যে একজন সঙ্গীর সাহচর্য স্বর্গ সুখের ঊর্ধ্বে। হযরত আদম (আ.) এর সময় থেকে অর্থাৎ মানব সৃষ্টির শুরু থেকে নর-নারী তথা মানব-মানবীর সম্পর্ক ছিল এবং তা যুগ থেকে যুগে সেই সম্পর্কের বিস্তার লাভ করেছে।

ইতিহাস পর্যালোচনায় জানা যায় নারী-পুরুষ আর্থনীতিকভাবে উভয়েই স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। তখন কারো প্রতি কোনো দায় ছিল না। ক্রমে যখন শ্রমবিভাজন, জাতি বৈষম্য দেখা দিল তখন সম্পত্তি ব্যক্তি মালিকানাধীন হতে থাকে। তারচেয়ে বড় কথা নারী-পুরুষের এ দৈহিক সংস্পর্শে

* প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, পাঁচরুখী বেগম আনোয়ারা কলেজ, আড়াইহাজার, নারায়ণগঞ্জ

সন্তান জন্ম নিলে সন্তানের পিতৃ পরিচয় অজ্ঞাত রয়ে যাচ্ছে। তাতেও পুরুষের মাথা ব্যথা ছিল না। অর্থ সম্পদের মালিকানার প্রশ্নে উত্তরাধিকারের প্রয়োজনে পুরুষ সন্তানের পিতৃত্বের দাবি নিয়ে ভাবতে শুরু করে। তখন একজন পুরুষের একজন নির্দিষ্ট নারী অর্থাৎ বিয়ের ধারণা লাভ করে। বিয়ের মাধ্যমে সংসারের সূচনা হয়।[১]

নর-নারীর এই সম্পর্ককে সেই প্রাচীনকালের সাহিত্য চর্যাপদ থেকে সাহিত্যে স্থান পেতে দেখা যায়। ২ নং চর্যাপদে কুক্কুরিপাদানাম বলেছেন-

'দিবসহি বহূড়ী কাউহি ডর ভাই
রাতি ভইলে কামরু জাই।'[২]

সমাজে সকলের ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে থাকা বউটিও রাত হলে যৌনতৃষ্ণা নিবৃত করতে অভিসারে যায়। তাই কামতৃষ্ণাকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই। আর এই কাম তৃষ্ণার আকর্ষণেই একজন নারী ও পুরুষ কাছাকাছি আসে। নর-নারীর এই দৈহিক মেলামেশাকে ভিত্তি করেই তারা অবাধে ব্যভিচারে লিপ্ত হয়। আর এসব অবাধ মেলামেশার কথা বেশ খোলাখোলিভাবে আমাদের সাহিত্যে প্রবেশ করেছে।

আধুনিক উপন্যাসে অবাধ মেলামেশাকে ঔপন্যাসিকদের অনুমোদন লাভ করতে দেখা যায়। মধ্যযুগের সকল সমাজেই নরনারীর অবাধ যৌন মিলনের নানা প্রকার সামাজিক ও নৈতিক বাধা ছিল। আধুনিক যুগের ইউরোপীয় সমাজে এ বাধা অপসারিত হয়েছে এবং বর্তমান যুগে যৌবনপ্রাপ্ত নরনারীর অবাধ যৌন মিলনকে মানব জীবনের স্বাভাবিক বৃত্তি বলে মনে করা হয়। বাঙালি মুসলিম সমাজ এ বিষয়ে যদিও অতটা অগ্রসর হয়নি, তথাপি বস্তুবাদি সাহিত্যিকগণ নরনারীর অবাধ মেলামেশাকেই অনুমোদন দিয়ে থাকেন।[৩] তবে সাহিত্যিকগণ শুধু অবাধ মেলামেশাকেই নয়, তুলে ধরেছেন দৈহিক আকর্ষণে নারীকে চিরকাল কাছে পাওয়ার বাসনাকেও। কাহ্ন পাদানাম ১০ নং পদাবলিতে লিখেছেন, 'আলো ডোম্বি তোএ সম করিব মই সাঙ্গ/ নিঘিণ কাহ্ন কাপালি জোই লাঙ্গ।'[৪] তারপর মধ্যযুগের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যেও নর-নারীর জৈবিক সম্পর্কের ব্যাপক উল্লেখ রয়েছে। নৌকা খণ্ডে রাধাকে নৌকা পারাপার করতে রাধাকে দিয়ে কৃষ্ণের রতি-ক্রিয়া করার অঙ্গীকার করিয়ে নিতে দেখা যায়। 'সরস বচন করি মান শৃঙ্গার বচন আহ্মার পাল এ।'[৫] জৈবিক প্রয়োজন থেকে নর-নারী সম্পর্কের সূত্রপাত হলেও বর্তমানে সেই সম্পর্ক বহূমাত্রিক সম্প্রসারণ ঘটেছে। সেই সম্পর্কগুলো স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, মাতা-পুত্র, পিতা-কন্যা এবং সাধারণ নর-নারী। প্রতিটি সম্পর্কের দৃষ্টিকোণ স্বতন্ত্র। আমাদের সাহিত্যাঙ্গনের কলা-কুশলীগণ সেই সম্পর্কগুলিকে চমৎকার সূত্রে আবদ্ধ করে তার ব্যাখ্যা করেছেন মনোজ্ঞ বর্ণনায়।

মধ্যযুগের দেব-দেবী নির্ভর সাহিত্য যখন পাঠক সাধারণের একঘেঁয়েমির কারণ হয়ে ওঠছিল তখন সাহিত্যিকগণ সর্বপ্রথম সূচনা করলেন সাহিত্যে মানুষের কথা বলা। মানুষের কথা বলতে গিয়ে তাঁরা প্রথম আশ্রয় করলেন মানুষের কল্পনাপ্রবণতাকে। অর্থাৎ রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যান। সেখানে তারা দেখাতে চাইলেন জৈবিক আকর্ষণে কাছে আসা দুটি নর-নারীকে। ক্রমে সেই সাহিত্য সাধারণ জন মানুষের কথা হয়ে ওঠে। দৌলত উজির বাহরাম খাঁন, কোরেশী মাগন ঠাকুর, কায়কোবাদ সহ আরো অনেক কবি সাহিত্যিকগণের সৃষ্টি মানব-মানবীরা আজ বিশ্ব সাহিত্যে স্থান পেয়েছে। তার ধারাবাহিকতা আধুনিক যুগের খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের দ্বারা

প্রসার লাভ করেছে। সেই খ্যাতিমান সাহিত্যিকদের মধ্যে সেলিনা হোসেন অন্যতম। তাঁর সৃষ্টি মানব-মানবীরা আমাদের চারপাশের জগত থেকে নেয়া বাস্তবতার কষাঘাতে জর্জরিত। ষাটের দশকে সেলিনা হোসেনের লেখালেখির সূচনা লগ্ন থেকেই তিনি একজন সমাজ সচেতন লেখক। বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালে তিনি প্রচুর সাহিত্যগ্রন্থ পড়েছেন। নামজাদা লেখকদের চিন্তাপ্রসূত উচ্চারণগুলোকে তিনি ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেছেন। তেমনি মার্ক্স-এঙ্গেলসের রচনা পড়েই তিনি নর-নারী সম্পর্কের সূত্র ব্যাখ্যা করার চিন্তা তাঁর মাথায় আসে।[৬] তাছাড়া তাঁর বাল্যে যখন যেভাবে সুযোগ হয়েছে সাধারণ মানুষের কাছাকাছি এসেছেন, তাদের সুখ-দুঃখ প্রত্যক্ষ করেছেন এবং সমৃদ্ধ করেছেন তাঁর মানব-মানবীর সম্পর্কের সঞ্চয়। তিনি বলেন-

> তখন আমরা বগুড়ায় থাকতাম। বাবা চাকরিজীবী ছিলেন। গরীব-দুখীদের সাহায্যের জন্য হোমিওপ্যাথির চর্চা করতেন। আমি তাকে পুরিয়া বানিয়ে দিয়ে সাহায্য করতাম। সে সময় দেখেছি নানা রকম মানুষ তার কাছে আসতো। তারা অনেক গল্প করতো, মন দিয়ে শুনতাম। এই গল্পগুলো আমার মানব-মানবীর সম্পর্কের সেরা সঞ্চয়।[৭]

তারপর তিনি তাঁর ব্যক্তিজীবনে দেখা এবং বুঝার সম্পর্কগুলিকে গল্পে সাজালেন নিম্নরূপে:

১. স্বামী-স্ত্রী রূপে নর-নারীর চিত্রায়ণ
২. ভাই-বোন হিসেবে নর-নারীর চিত্র
৩. পিতা-কন্যা সম্পর্কের সূত্রে নর-নারী
৪. মাতা-পুত্রের ভূমিকায় নর-নারীর উপস্থিতি

স্বামী-স্ত্রী রূপে নর-নারীর চিত্রায়ণ

নারী-পুরুষের জৈবিক আকর্ষণে সৃষ্ট পবিত্র এবং সর্বজন স্বীকৃত যে সম্পর্ক তৈরি হয় তার নাম স্বামী-স্ত্রী। সৃষ্টির আদিকাল থেকে নারী-পুরুষ দৈহিক আকর্ষণে একে অন্যকে কাছে পেয়েছে ও গর্ভে সন্তানও ধারণ করেছে। তবে এ সম্পর্কের না ছিল কোনো নাম, না ছিল সন্তানের কোনো পিতৃ পরিচয়। এমন কী মানুষ তখন জানতই না যে নারী-পুরুষের এ দৈহিক মিলনের ফলে নারীর গর্ভে সন্তান আসে। তারা সবাই এ সন্তানকে প্রকৃতির দান ভেবে গ্রহণ করেছে। কিন্তু সভ্যতার ক্রমবিকাশে এ দৈহিক সম্পর্কের একটি নাম হয় এবং পরিবার প্রথার সূচনা হয়। আর এ পরিবার গঠনের পূর্ব-শর্ত হচ্ছে বিয়ে, যা কিনা দু'জন নর-নারীকে একসঙ্গে আবদ্ধ হয়ে জীবন-যাপনের নির্দেশ দেয়। নারী-পুরুষ এভাবে একসঙ্গে বসবাসের যে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হয় সেই সম্পর্কের নাম স্বামী-স্ত্রী। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষেরা এবং মাতৃতান্ত্রিক সমাজে নারীরা পরিবারের ভরণ-পোষণের দায়িত্ব নেয়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ একটি পরিবারের সর্বেসর্বা। মাতৃতান্ত্রিক সমাজেও নারীই পরিবারের সর্বেসর্বা। কিন্তু আমাদের সমাজে গুটি কতক ক্ষুদ্র নৃ-গাষ্ঠী ব্যতীত মাতৃতান্ত্রিক পরিবারের দেখা পাওয়া যায় না বললেই চলে। আমাদের দেশ পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় চলমান। তাই এ দেশের অধিকাংশ লেখক সাহিত্যিকের রচনায় পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে দু একটি ব্যতিক্রমী চিত্রও দেখা যায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীকে অধিকাংশ ক্ষেত্রে বঞ্চনার শিকার হতে দেখা যায়। এমন কি মধ্যযুগের সাহিত্যের প্রধান শাখা মঙ্গল কাব্যে 'নারীর পতি বিনে গতি নেই' বলেও উল্লেখ রয়েছে।

স্বামী বনিতার পতি স্বামী বনিতার গতি
স্বামী বনিতার সে বিধাতা।
স্বামী যে পরমধন স্বামী বিনে অন্যজন
কেহ নহে সুখ-মুক্ষ-দাতা ॥[৮]

নারী মানুষ হিসেবে তারা যে স্বকীয়তা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিল সেকথা তাদের মন থেকে মুছে দেয় পুরুষতন্ত্র। এভাবে নারীর পুরুষের প্রতি নির্ভরশীলতা, নিজের জ্ঞান সম্পর্কে ও অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞতা নারীকে আস্তে আস্তে পুরুষের কাছে দুর্বল হতেও দুর্বলতর করে তুলেছে। এভাবেই চলতে থাকা নর-নারীর সম্মিলিত দুষ্টু-মিষ্টি, মান-অভিমান আর খুনসুটির মধ্য দিয়ে বয়ে চলা জীবনচিত্র তুলে ধরে সাহিত্য রচনা করেছেন সেলিনা হোসেন।

একজন নারী অনেক স্বপ্ন নিয়ে বিয়ে করে স্বামীর ঘরে আসে। একটা সুন্দর সংসার, সন্তান আর সর্বোপরি স্বামীর ভালোবাসা এসব থাকে নারীর কল্পনার রাজ্য ঘিরে। স্বামীকে কাছে পাওয়াটা নারীর সকল না পাওয়াকেও পূর্ণ করে দেয়। কিন্তু সেলিনা হোসেনের *বৈশাখী গান* ছোটগল্পে ইকতি সেই হতভাগী নারী যার স্বামীকে কাছে পাওয়ার বাসনা বিয়ের মাত্র কিছুদিনেই মারা যায়। বছরের ইদের দিনসহ মাত্র কয়েকটা দিন স্বামীকে কাছে পায় সে। 'এই কটা দিন তৃপ্তি হয় না ইকতির। তাই ভয়ানক রাগ।'[৯] বছরের যে কয়টা দিন দু'জনের একসঙ্গে থাকা হয়, সেই কটা দিন মান-অভিমানেই কেটে যায় সীমান আর ইকতির দাম্পত্য সম্পর্ক। সীমানও যথেষ্ট সমঝদার স্বামী। স্ত্রীকে স্বামীসুখ দিতে না পারার ব্যর্থতার দায় মাথা পেতে নেয়। যৌবনবতী স্ত্রীকে সর্বসুখ দিতে না পেরে তার যৌবন চাহিদাকেও সে অসম্মান করে না। তাইতো মসজিদের ইমাম সাহেবের ছেলে সাজনের সঙ্গে ইকতির গোপন প্রণয়কে বেশ সহজ এবং দায়িত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে। ইকতির গর্ভে সাজনের সন্তান এলে গ্রামের লোক বিশেষ করে ইমাম সাহেব যখন ইকতিকে অকথ্য অপমান করে এবং গ্রাম থেকে তাকে বের করে দিতে চায় তখন সীমান এসে বটবৃক্ষ হয়ে ইকতিকে ছায়া প্রদান করে, গ্রামের সবার সামনে ইকতির সম্মানকে সে উলঙ্গ হতে দেয়নি। ভরা সভায় সে স্ত্রীর পক্ষ হয়ে বলে উঠে, 'আপনেরা হেরে ইয়ানে আইনছেন কিয়ের লাই? হে যদি কোনো দোষ করে তার শাস্তি আঁই দিউম! আপনেরা কে?'[১০]

ইকতির মত আরেকটি স্বামী সোহাগ বঞ্চিত নারী *কান্নার তৃতীয় দিন* ছোটগল্পের জমিলা খাতুন যে রঙিন স্বপ্নে বিভোর হয়ে স্বামীগৃহে এসেছিল তা অঙ্কুরেই বিনষ্ট হয়েছিল হামিদ আলীর কারণে। তবে ইকতির স্বামী ইকতিকে যথেষ্ট বুঝতো, শুধু সাধ্যের অভাবে কাছে রাখতে পারেনি। ইকতিকে যতটুকু সম্ভব হয়েছে ভালবাসায় ভরিয়ে দিয়েছে তার স্বামী। কিন্তু জমিলা খাতুনের স্বামী হামিদ আলী বিয়ের রাতেই তাকে বলে দিয়েছে 'আমার সংসারের প্রয়োজনে তোমাকে এনেছি। এর বেশি কিছু দাবি করো না'[১১] শাস্ত্রে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ককে সর্বাধিক মধুময় বলা হলেও জমিলা খাতুন মধুময় জীবনের স্পর্শ পায়নি। 'মন দেয়নি হামিদ আলী কোনোদিন কিন্তু নিজের অংশটুকু কড়ায় গণ্ডায় বুঝে নিয়েছিলো।'[১২] দাম্পত্য সম্পর্কে অতৃপ্ত জমিলা খাতুনের তাই প্রাণবন্যার অধিকারী নতুন ভাড়াটে নব দম্পতির মধুময় দাম্পত্য সম্পর্ক দেখে নিজের অতৃপ্তিগুলি আবার মাথাচড়া দিয়ে ওঠে। নিজে যে সুখ পায়নি, আজ পড়ন্ত যৌবনে এসেও নব দম্পতির প্রেম মাখামাখিতে ঈর্ষান্বিত হয় এবং তাদের বাসা থেকে তাড়িয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। 'অধিকাংশ লোকে স্ত্রীকে বিবাহমাত্র করে, পায় না, এবং জানেও না যে সে পায়

নাই; তাহাদের স্ত্রীদের কাছেও আমৃত্যুকাল এ খবর ধরা পড়ে না।'[১৩] সেলিনা হোসেনের *রতিবিলাস* ছোটগল্পের হাসিব খানও তার স্ত্রীকে মন্ত্রবলে মুসলিম সমাজের প্রথা অনুযায়ী] শুধু বিয়ে করেছে, তাকে পায়নি কখনো।

> কতদিন রাতের অন্ধকারে হাসিব খান যখন উত্তেজিত হতো-মিসেস খানের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও যখন হারিয়ে যেতো যোনির এক সমুদ্র অন্ধকারের মাঝে তখন মিসেস খানের সমস্ত কাল্পনিক বোধশক্তি আহত হতো-ক্ষুণ্ন হতেন তিনি। তার ভাবুক মন শতমুখে প্রশ্ন করতো ভালোবাসাটি কি শুধু দৈহিক?[১৪]

মিসেস খানের কাছে স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের মানে ছিল দুজনের বোঝা-পড়ার বিষয়। পুরুষের একতরফা দেহ ভোগে তিনি বিশ্বাস করতেন না। হাসিব খানের উত্তেজিত মুহূর্তের অবসানে তাকে প্রশ্ন করতেন "আমার দেহটার মূল্যই কি তোমার কাছে বড়ো? তুমি কি আমায় ভালবাসো না? হাসিব খান হেসে ফেলতেন। আরো ঘন হয়ে বলতেন, 'আমি তোমায় ভালোবাসি অস্থিমাংস সহ'।"[১৫] মিসেস খান এমন উত্তর আশা করেনি স্বামীর কাছে। এই পরিস্থিতিতে পুরুষতন্ত্রের এই হীনবাসনাকে শুধু ঘৃণা করেছে মনে মনে। সেলিনা হোসেনের আদিম মানব প্রবৃত্তির ছোটগল্প *উৎস থেকে নিরন্তর* ছোটগল্পে সুরত আলী তার স্ত্রীকে যার পর নাই ভালোবাসে। জেলে গিয়ে স্ত্রী ওজুফার জন্য মন খারাপ হয়। মালিকের মদখোর ছেলেটা যে সর্বক্ষণ হা করে ওজুফার যৌবনের পানে তাকিয়ে থাকে তার কথা ভেবে আতঙ্কে থাকে সর্বক্ষণ। জেল থেকে মুক্তি পেয়ে স্ত্রীর কাছে এসে জানতে পারে জেলে বসে তার যে আতঙ্ক তাই সত্যি হলো। বদমায়েশটা তার স্ত্রীর গর্ভে সন্তানের জন্ম দিল। এতে সুরত আলী প্রথমে রেগে স্ত্রীকে প্রহার করলেও বুঝতে পারে যে এতে ওজুফার কোনো ভুল ছিল না। তাই মালিকের বখাটে ছেলেকে নিজ হাতে খুন করে। কিন্তু সন্তানবৎসল সুরত আলী সেই বখাটের জন্ম দেয়া ছেলেকে শুধু স্ত্রীর প্রতি ভালোবাসার কারণে বুকে টেনে নেয়। বলে-

> আমি ওকে মানুষ করবো ওজুফা। ও আমার ছেলে। তোর রক্ত আছে ওর গায়ে- ও তোর ছেলে- ও মানুষের ছেলে। আমি আর কিছু জানতে চাই না- ও আমার, ও আমার- ও আমার।[১৬]

স্ত্রীর প্রতি স্বামীর ভালোবাসায় স্ত্রীর ওপর নির্যাতনের ফসলকেও স্বামী উদার দৃষ্টিতে গ্রহণ করে। দাম্পত্য সম্পর্কের সবচেয়ে বড় বুনিয়াদ হলো বিশ্বাস আর ভালোবাসা। এক্ষেত্রে নারীবাদী দৃষ্টিতে শুধু পুরুষের দোষটুকুই খোঁজা সেলিনা হোসেনের উদ্দেশ্য নয়। তিনি নিজে একজন নারী হয়েও নারীর সত্য উপস্থাপন করেছেন। নারীবাদী মানে পুরুষ বিদ্বেষ নয় বরং নারী-পুরুষ আলাদা নয় তাই তুলে ধরা। দোষে-গুণে পরিপূর্ণ হয় মানুষ; তা নারীই হোক বা পুরুষই হোক। *মৌসুমে ডিমের গন্ধ* ছোটগল্পে মোতালেব ভালোবেসে তার বউকে ঘরে আনলেও বউ এর পক্ষ থেকে সেই ভালোবাসাটা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। যে বউ 'একদিনের অদর্শনে অস্থির হয়ে উঠতো'[১৭] অল্প কিছুদিন পর থেকেই বউ এর দুর্ব্যবহারে স্বামী মোতালেবের স্ত্রীর প্রতি ঘৃণা তৈরি হয়। এমন কি পর নারীর প্রতি আকর্ষণও তৈরি হয়। দাম্পত্য সম্পর্কে এটা খুব স্বাভাবিক। কারণ দাম্পত্য সম্পর্ক স্থায়ী হয় বিশ্বাস, ভালোবাসা আর আকর্ষণে। এর একটির ঘাটতিতে দাম্পত্য জীবন হয়ে উঠে দুর্বিষহ।

পুরুষের অস্তিত্ব জুড়ে নারী লতার মত জড়িয়ে থেকেই পুরুষকে করেছে সার্থক। সমস্ত সম্পত্তির মাঝে পুরুষ যখন সুখ খুঁজে পায় না তখন তার একমাত্র আরাধ্য হয় নারী। পুরুষের ভাষ্য হচ্ছে 'আমি নারী চাই, ধান চাই, আগুন চাই।'[১৮] স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সূত্র ব্যাখ্যায় সেলিনা হোসেন স্বতন্ত্র। তিনি তাঁর গল্পে নারী পুরুষকে বেঁধেছেন ভালোবাসায় আর বিশ্বাসের বন্ধনে। যেখানে আর্থনীতিক বাঁধা তাদের মাঝখানে বিঘ্ন ঘটাতে পারেনি। *স্রোত* ছোটগল্পে ঐশ্বর্য আর বিলাসিতায় বেড়ে ওঠা পারুল ভালোবেসে এক কাপড়ে ঘর ছাড়ে চুনুর সঙ্গে। দীন-দুখী চুনু পারুলকে ঐশ্বর্য দূরের কথা মৌলিক চাহিদাগুলি পূরণ করতে অক্ষম। কিন্তু পারুল যাকে ভালোবেসেছে তাকে স্বামী হিসেবে পাওয়ার বাসনা করেছে এবং করেছেও তাই। অর্থকড়ির অভাব থাকলেও চুনু আর পারুলের বাঁধা নীড়ে অভাব নেই সুখ-উচ্ছ্বাসের। ভালোবাসার শাসনে দু'জন দু'জনকে নিয়ন্ত্রণ করে, খাইয়ে দেয় আরো কত রঙ্গলীলা। চুনু নিজের হাতে ভাত খেতে না চাইলে পারুল বলে 'আমি যহন আছিলাম না তহন ভাত খাও নাই?'[১৯] কিন্তু ভালোবাসার কাঙ্গাল এবং স্ত্রীর প্রণয় প্রত্যাশী চুনু জবাব দেয় খাইছি। সেই খাওয়া আর এই খাওয়ার মধ্যে অনেক তফাৎ। তহন খাইছিলাম প্যাটের তাগিদে, অহন খাই মনের তাগিদে। অহনকার ভাত একদম আলাদা।'[২০] এমন নিরবচ্ছিন্ন সুখ কাউকে আবার একঘেয়ে করে ফেলে। পানসে করে দেয় অনেক স্বামী-স্ত্রীর জীবন। তাই কোনো কোনো স্বামী-স্ত্রী আবার ছোটো খাটো খুনসুটির সূত্রপাত করে বেশ উপভোগ করে। তেমনি 'মানুষটি' ছোটগল্পে নিজের বৌকে টিপ্পনি কেটে মজা পেতো মানুষটি [নাম উল্লেখ নেই]। সহজ সরল বৌকে টিপ্পনী কাটার মত কোনো ত্রুটি খোঁজে না পেলেও তার কর্মস্থলের অধ্যক্ষের কক্ষে যাওয়াকে কেন্দ্র করে পানসে সুখের জীবনে একটু টক-ঝাল ঘটনার সূত্রপাত করে 'সেদিন শরিফ আলতাব [বউ যে কলেজে চাকরি করে সে কলেজের অধ্যক্ষ] তোমাকে দুবার ডেকেছিল কেন? কেন তুমি আশি মিনিট তার ঘরে ছিলে? প্রেমে পড়েছো নাকি?'[২১] যদিও মানুষটি জানে যে তার স্ত্রীকে পুরুষ সংক্রান্ত ব্যাপারে সন্দেহ করা যায় না। তথাপিও এমন প্রশ্ন কেবলই তার একঘেয়েমি দূর করার জন্য। সেলিনা হোসেন স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের সূত্র ব্যাখ্যায় সজাগ থেকেছেন সর্বত্র। নিরেট সুখ কীভাবে কারো জীবনকে পানসে করে দেয় তা লক্ষ করেছেন তাঁর জীবন দৃষ্টি দিয়ে। সেই মানুষটিকে কখনো কখনো মা এবং স্ত্রীর ঝগড়ার মাঝখানে বিড়ম্বিত হতে হয়েছে। গুরুত্বের বিচারে মানুষটি স্ত্রী এবং মায়ের মধ্য থেকে কাউকে ছোট ভাবতে পারেনি; তাই কারো পক্ষ তার নেয়া হয় না বলে নীরবে ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বেঁচে যায়।

কখনো নারী হৃদয়া নারী একজন পুরুষের প্রণয়ে ভুলে যায় সব ব্যবধান। পুরুষের বাহুডোরে নিজেকে বাঁধতে চেয়েছে সমগ্র নারী সত্তা দিয়ে। দ্বিগুণেরও বেশি বয়সের পুরুষ আবদেলকে ভালোবেসে বিয়ে করে আছিয়া। তার ছোটো বোন পাত্রের বয়স নিয়ে কথা বললে সে বলে 'বয়সের হেরফেরে কি আসে যায়? মানুষের হৃদয়ই সব।'[২২] শুধু চেয়েছিল ভালোবেসে সকল ব্যবধান ভুলে থাকবে। কিন্তু দাম্পত্য জীবনে প্রবেশ করেই আছিয়ার স্বপ্ন ভেঙ্গে চুরমার হয়। আবদেল মানুষ হিসেবে ভালো হলেও স্বামী হিসেবে ভালো হয়ে উঠতে পারেনি। তবে আছিয়ার প্রতি সমস্ত দায়িত্ব সে যথাযথ পালন করে, তার কোনো অভাব রাখেনি, কিন্তু আছিয়া এসব চায়নি। আছিয়া চেয়েছে আবদেল পৌরুষত্ব দিয়ে তাকে তুষ্ট করুক।

> আবদেল ওকে যত্ন করে। হাট থেকে ভালো মাছ তরকারি কিনে আনে। তেল, সাবান ডুরে শাড়ি এনে দেয়। আছিয়ার ভালো লাগে না। ও আবদেলের কাছে আরো আবেগ চায়। সে আবেগ ওর নতুন যৌবনের জন্য প্রয়োজন। কিন্তু আবদেল এসব বোঝে না। বোঝে পাঙ্গাস মাছ আর সুবাসিত তেলই বুঝি আছিয়ার জন্য জরুরি।[২৩]

এমন অনাকাঙ্ক্ষিত সম্পর্কের জাল ছিন্ন করে আছিয়ার বৈধব্য বাণীকে সত্যি করে বিয়ের মাত্র দেড় বছর পর আবদেল যখন মারা যায় তখন আছিয়ার এই বৈধব্য প্রাপ্তিতে কোনো দুঃখ অনুভূত হয় না। 'বিশ্বাস করতে কষ্ট হয় যে এই বৈধব্যের জন্য আছিয়ার কোনো দুঃখ নেই।'[২৪] আছিয়ার আরেকরূপ দেখতে পাই আমরা *লিপিকার বিয়ে এবং অতঃপর* ছোটগল্পে লিপিকা চরিত্রের মধ্যে। তবে আছিয়ার মত লিপিকাকে বৈধব্য বরণ করতে না হলেও এমন দাম্পত্য জীবনও তার কাম্য নয়। যেখানে স্বামী আফসার আহমদ বাসর ঘরেই নিজের সিদ্ধান্তের কথায় জানিয়ে দেয় লিপিকাকে। সে জানায় সংসারে কোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার ব্যাপারে লিপিকার কোনো অধিকার থাকবে না। এমন কি সন্তান ধারণের ক্ষেত্রেও সে যা চায় তাই হবে। আফসার আর লিপিকার দৈনন্দিন জীবনের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ড অস্বাভাবিক হয়ে ওঠেনি স্বামী আফসারের পুরুষালি আক্রমণাত্মক মনোভাবের কারণে। যে উদরে সন্তান ধারণ হবে সে উদরের মালিকের কোনো কিছু বলার অধিকার নেই। সমালোচক যথার্থই বলেছেন, 'সৃষ্টির রহস্য খুঁজলে আরেকবার নতুন করে প্রমাণিত হবে, পুরুষ স্বার্থপর ও নারী কল্যাণময়ী, নিঃস্বার্থপ্রাণ।'[২৫] সামাজিক সকল কর্মকাণ্ড এমন কি সন্তান ধারণের ক্ষেত্রেও পুরুষ স্বার্থপরতার পরিচয় দিয়ে থাকে। এ ব্যাপারে পূরবী বসু প্রাণীকূলের কিছু স্বার্থপরতার চিত্র তুলে ধরেছেন।

> মাছির কথাই ধরা যাক। পুরুষ ও মেয়ে মাছি একবার সঙ্গমে লিপ্ত হওয়ার পর মেয়ে মাছি তার শরীরের গুপ্ত পকেটে প্রায় পাঁচশো শুক্রানু জমা করে রাখতে পারে। যতক্ষণ না মিলনের জন্যে তার নিজস্ব ডিম্বকোষ তৈরি হচ্ছে, সে এই শুক্রাণুগুলো ধরে রাখতে পারে। তবে পরবর্তী সঙ্গমে প্রাপ্ত শুক্রানু অনায়াসে আগেরগুলোর জায়গা দখল করে নিতে পারে। সেটা পুরুষ মাছি ভালো করেই জানে। আর তাই নিজের জিন রক্ষা ও তার পবিত্রতার নিশ্চয়তা দান করতে পুরুষ মাছি তার বীর্যের সঙ্গে প্রায় ষাট রকম প্রোটিন ঢেলে দেয় মেয়ে মাছির শরীরে। প্রথমত এগুলো তার বীর্যকণাকে খাদ্য ও শক্তি জোগায় নিষেক ক্রিয়ার সফলতা নিশ্চিত করার জন্যে।
>
> দ্বিতীয়ত, এ প্রোটিনগুলো মেয়ে-মাছিটির যৌনাকাঙ্ক্ষা দাবিয়ে রাখে, যাতে সে অন্য পুরুষ মাছির সঙ্গে মিলিত হতে আগ্রহী না হয়। ... একই জিনিস ঘটে এক ধরনের বন্য বিড়ালের মধ্যেও। সঙ্গমের পর পুরুষ বিড়ালটি সার্বক্ষণিকভাবে পাহারা দিয়ে রাখে স্ত্রী বিড়ালটিকে- যতক্ষণ পর্যন্ত মেয়ে-বিড়ালটি যৌনতাড়িত থাকে। এই পাহারা দেওয়ার একটাই উদ্দেশ্য। মেয়ে বিড়ালটি যাতে অন্য কোনো পুরুষ বিড়ালের সঙ্গে মিলিত হতে না পারে এবং তার শুক্রাণু দিয়েই নিশ্চিতভাবে যাতে জন্ম নেয় শিশু বিড়াল।[২৬]

মনুষ্যকূলের পুরুষদের মধ্যেও বরাবরই মাছি এবং বিড়ালের মতো নারীর উদরে দখলদারিত্ব ছিল। তারা নিজেদের স্বার্থে নারীর উদর দখল নিত। বিয়ের প্রথম রাতেই আফসার ও লিপিকার যে সম্পর্ক তৈরি হয়নি তা প্রতি মুহূর্তেই শুধু দূরত্ব তৈরি হয়েছে। আফসার লিপিকার পানে দু'পা এগিয়ে এসে বলে-

> শোবে না?

-হ্যাঁ, শোবো তো। ইয়ে মানে তুমি রেডি তো?
- রেডি? ঠিক বুঝতে পারলাম না তোমার কথা?
-আমি কিন্তু তাড়াতাড়ি মা হতে চাই না।
-লিপিকা?
আফসার চেঁচিয়ে উঠে।
-এসব কী বলছো?
-কেন বলবো না? বিষয়টা দুজনের ইচ্ছে-অনিচ্ছের ব্যাপার।
-না, আমার একার।
আফসার সঙ্গে সঙ্গে জেদের সঙ্গে বলে।[২৭]

অথচ, পারিবারিক ব্যবস্থাবলিকে ইসলামি ধাচে পরিচালনার জন্য যে তিনটি বুনিয়াদের কথা বলা হয়েছে তার মধ্যে 'পারস্পরিক পরামর্শ' অন্যতম।[২৮] বাসরঘরে আফসার এবং লিপিকার কথামালায় সেই পারস্পরিক পরামর্শটুকুর ঘাটতি দেখা যায়। এরকম দাম্পত্য জীবনে অতিষ্ঠ লিপিকার জীবন কুকড়ে যাচ্ছে প্রতিমুহূর্তে। শুধু নারী নয় স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কে অনেক সময় পুরুষকেও এই যন্ত্রণার বোঝা বয়ে বেড়াতে হয়। অন্তঃসারশূন্য একটা লোক দেখানো সম্পর্কের বোঝা ভিতরে নিঃশেষ করে দেয় *দুর্নীতি* ছোটগল্পের নিয়ামত রসুলের জীবন। বাবা মায়ের পছন্দে বিয়ে করলেও বিয়ের অল্পকাল পরেই রসুলের আদর্শে প্রতিঘাত হয় তার স্ত্রী আফরোজার দ্বারা। সৎ পুলিশ অফিসার দেখে নয়, আফরোজা নিয়ামতকে বিয়ে করে শুধু উপরি পাওনার সুযোগ আছে বলে; এ অভিমত এক নিমেষে নিয়ামতের সংসার করার স্বপ্নকে ধুলিস্যাৎ করে দেয়। প্রাণে যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বাবা মায়ের আদর্শ বুকে লালন করে বড় হয় এবং বিয়ের স্বপ্ন দেখে সেই স্বপ্ন তার জীবনে হানা দেয় আদর্শচ্যুতির আশঙ্কা হয়ে। কিন্তু নিয়ামতের আদর্শে বিচ্যুতি ঘটার নয়- তাই সংসার তার শেকড় বিস্তার করে না। আফরোজা মা হওয়ার বাসনা ব্যক্ত করলেও যে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্কের মাঝে দুর্নীতি আছে সেই সম্পর্কের সূত্র ধরে আর কারো আগমন নিয়ামত প্রত্যাশা করে না।

স্বামী-স্ত্রী একটি পবিত্র সামাজিক সম্পর্কের নাম। তবে এ সম্পর্ক কোনো সূত্রবলে প্রাপ্য নয়, এ সম্পর্ক অর্জনের। শুধু বৈবাহিক আনুষ্ঠানিকতায় এ সম্পর্কের মধুর রস আহরিত হয় না। ভিন্ন এবং স্বতন্ত্রধারার দুটি মানুষ এক হয়ে তাদের চিন্তা চেতনা এবং কর্মক্ষেত্রে একাত্মতা অনুভবের নামই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক। শুধু বিয়েই স্বামী-স্ত্রী সম্পর্ক তৈরির প্রধান শর্ত নয়, তবে প্রথম শর্ত। এখানে একজন আরেকজনে পাওয়ার ব্যাপার থাকে। এ পাওয়া দুজনের প্রতি দুজনের দায়িত্ব, কর্তব্য এবং বোঝাপড়ার উপর নির্ভর করে। অনেক স্বামী-স্ত্রীর মধ্যকার সম্পর্কে অর্থনীতিক প্রশ্ন জড়িয়ে পড়ে। অথবা, তাদের সম্পর্কের অর্থাৎ দায়িত্বের অনুষঙ্গ অর্থ দ্বারা পরিমাপ হয়, সেসব ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী বিয়ে করে প্রায়শ্চিত্ত করছেন বলে মনে করেন। জীবনের সমস্ত ভুলের খেসারত মনে করেন একে অপরকে। দাম্পত্য সম্পর্ক তখন দুর্বিষহ হয়ে পড়ে। কিন্তু সেলিনা হোসেন তাঁর *সিজ ফায়ার* ছোটগল্পে দেখিয়েছেন স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে একাত্মতা অর্জনের জন্য দুজনের বিবেচনা এবং অনুভূতিশীল হৃদয়ই যথেষ্ট। *সিজ ফায়ার* ছোটগল্পে নূরুদ্দিন ও তাহেরুন দম্পতি শাক পাতা দিয়ে পান্তা খেয়ে দিন কাটালেও অট্টহাসি তাদের নিত্যসঙ্গী। স্বামী নূরুদ্দিন মুক্তিযুদ্ধ করে বীরপত্তিক [বীরপ্রতীক] খেতাব পেয়েছে বলে তাহেরুনের গর্বের অন্ত নেই। তাইতো দু'বেলা দু'মুঠো আহার না জুটলেও মনে কোনো দুঃখ নেই তার।

বিয়ের পরে তাহেরুন ভীষণ গৌরবে নূরুদ্দিনের বীরপ্রতীক শব্দটি ধরেও রেখেছে নিজের ভেতর, এ গাঁয়ে আর কারও নামের সঙ্গে এ শব্দটি নেই। ও ভাবে স্বামী এবং সংসার পাওয়ায় এই শব্দটি ওর বাড়তি পাওয়া, গরীব মানুষের ধন। নিজের ভিটেয় ঘুমুনোর যে আনন্দ, এটাও তেমনি। জমি-জিরাত সব গিয়ে দুটাকার মজুর হয়েছে তো কি হয়েছে, এই শব্দটা তো আছে।[২৯] শুধু তাই নয়, স্ত্রী তাহেরুনকে ছাড়া নূরুদ্দিন কোনোবেলা ভাত খায়নি। স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের গভীরতা মূলত এখানেই। 'ওর [তাহেরুনের] মা-খালারা স্বামীর খাওয়া শেষ হলে ভাত খেত। এমন ব্যবস্থা ও ভাবতেই পারে না।'[৩০] স্বামী স্ত্রী সম্পর্ক তৈরিতে সেলিনা হোসেন ধনি-দরিদ্র, সক্ষম-অক্ষম, শিক্ষিত-অশিক্ষিত সকল ব্যবধান ঘুচিয়ে এনেছেন। 'সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে, সুযোগ্য পতি যদি থাকে তার সনে' অজ্ঞাত লেখকের এই বহুল প্রচলিত কথাটির সত্যতা ধরা পড়ে সেলিনা হোসেনের *বুনো ফুলের মালা* ছোটগল্পে। এখানে দুর্দিনের তাড়া খাওয়া মানসী বিয়ের পর অন্য সাধারণ নারীরা যখন সংসারের হাঁড়ি চালাতে ব্যস্ত এবং স্বামীর এনে দেয়া দু'মুঠো পান্তায় তুষ্ট থেকে দিনরাত ভাগ্যকে অভিসম্পাত করে দিনাতিপাত করে দেয়, সেখানে সে স্বামীকে সাথে নিয়ে পরিবর্তন করে তার ভাগ্যের। যখন মানসী নিজে উপার্জন করে তার মায়ের অভাবের সংসারে সাহায্য করার কথা বলে তখন তার 'স্বামী মাথা নেড়ে সায় দেয়। বলে, উপার্জন করতে পারলে তাকেও সাহায্য করবো। তোমার মা আমারও মায়ের মতো।'[৩১]

স্বামী-স্ত্রী নর-নারীর সম্পর্কের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। দুটি ভিন্ন আত্মা, ভিন্ন দেহ, ভিন্ন ভিন্ন রুচিবোধ, চাহিদাসম্পন্ন মানুষ জীবনের মাঝখান থেকে একসাথে থাকার দৃঢ় প্রত্যয়ে সংসার নামক একটি সংগঠন গড়ে তোলে। সকল ভিন্নতা এক ছন্দে, এক ছকের মধ্যে এসে পরিসমাপ্তি ঘটে। তবে এখানে দুজন নর-নারীর সম্পর্ক যতটা না শরীরের তারচে বেশি আত্মিক। চর্মচক্ষুর চেয়ে দিব্যচক্ষুর ভূমিকা এই সংসার নামক সংগঠনটি টিকিয়ে রাখার ব্যাপারে অধিক ভূমিকা রাখে। এমনই এক ছোটগল্প হচ্ছে *অন্ধকার যখন পূর্ণিমা*। এ গল্পে আফসানা প্রথমে তার স্বামী জালালের দৈহিক উচ্চতায় তুষ্ট নয় বলে তার সাথে সংসার করতে নারাজ। কিন্তু তার ভালোবাসা, কোমলতা আর আফসানার প্রতি আকর্ষণে আফসানা মুগ্ধ হয়ে আর এই বেটে স্বামীটাকে ভালো না বেসে পারে না। আফসানার এই ভালোবাসা আরো গভীর হয় যখন দেখে কোনো এক কারণে তার পা দুটি অচল হয়ে গেলে তার স্বামীর সেবা শুশ্রূষা এবং আবেগময় আলাপে। জালাল তাকে ভাত মেখে খাইয়ে দেয়, চোখের পানি মুছে দেয়। তাকে রানী বলে সম্বোধন করে। দাম্পত্য জীবনের মধুময়তা সে উপলব্ধি করে তখনই। একমাত্র মেয়েকে ঘিরে তাদের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পরিকল্পনা সারা মুহূর্ত উপভোগ করে তারা। বর্তমান সমাজের সভ্যতার মাপকাঠি হলো নারী-পুরুষ সম্পর্ক।[৩২]

অর্থ লোভ আর লালসায় নৈতিকতার অবক্ষয়ে ঘুণধরা স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কের ছোটগল্প *কুন্তলার অন্ধকার*। সম্পর্কের ভিত তৈরিতে আর্থনীতিক নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। অভাবের হাতছানিতে চিরচেনা সুখ দুঃখের সাথীটিকে করে তুলে হিংস্র, নির্মম আর পৈশাচিক দৈত্য দানব। কুন্তলার মা শিউলি চিরচেনা বাঙালি নির্যাতিত নারীদের প্রতিনিধি। যার বাবা আজও মেয়েদের বিয়ে দেয় অনেক টাকা যৌতুকের শর্তে। কিন্তু অক্ষম বাবা যখনই তা দিতে পারে না তখন শিউলিদের তার স্বামীদের হাতে তিনবেলা মার খেয়ে পেট ভরতে হয়। মুস্তাফিজের অভাবের সংসার। ছোট্ট একটা চাকরি করতো। আজ তাও নেই। সেই অভাবের জন্য যেন

শিউলিই দায়ী। শিউলিকে তিনবেলা পেটাতে পারলে অভাবের প্রতি তার যত অভিযোগ তা সব দূর হয়ে যায়। অর্থ উপার্জনে অক্ষম গৃহিণী শিউলি বাবার কাছেও ফিরে যেতে পারে না বোঝা হতে। এসব নিয়তি নিয়েই শিউলিদের জন্ম, এবং এজন্ম তার সার্থক করতে হবে মার খেয়ে। শুধু মার খেয়ে নয়, সবশেষে বালিশ চাপায় স্বামীর হাতে খুন হতে হয় তাকে। আর তার স্বামীও চিরকাল বেঁচে থাকতে যেভাবে সকল দায় নারীর ঘাড়ে চাপিয়েছে, মৃত্যুর পরেও সকল দায় সেই অবলা নারীটির ঘাড়ে চাপিয়েই ক্ষান্ত হয়। আমাদের সমাজে পুরুষের চিত্র এতটাই ভয়াবহ যে নারী পুরুষ কর্তৃক নির্যাতিত হবে, খুন হবে আবার সেই খুনের দায় তাকে নিয়েই কবরে যেতে হবে। পুরুষরা নিজের মত করে তাদের অবস্থান এভাবেই তৈরি করে নেয়। আর তা দেখে সেলিনা হোসেন নিভৃতে জ্বলেছেন।

শিউলিকে মরে গিয়ে তার জ্বালা জুড়াতে দেখা যায়। কিন্তু *শেষ চিঠির পরে* গল্পে মুশফিকার স্বামীর জন্য অপেক্ষার জ্বালা তার আর জুড়ায় না। উচ্চশিক্ষা গ্রহণের জন্য স্বামীর বিদেশ যাওয়া তাকে স্বামীর প্রতি আরো অনুরক্ত করে তোলে। কাছাকাছি থাকতে যে মানুষটির সঙ্গে ভালোবাসায় জড়িয়ে কেটেছে প্রতি মুহূর্ত দূরে গেলে সে মানুষের প্রতি ভালোবাসা ও আকর্ষণ বাড়ে বৈ কমে না। সেই ভালোবাসা আর বিশ্বাস নিয়ে অপেক্ষার প্রহর যেন আর ফুরাতে চায় না। কিন্তু দীর্ঘকাল অপেক্ষার শেষে একটি চিঠি মুশফিকার অপেক্ষার অবসান ঘুচায়। তবে স্বামীকে কাছে পাওয়ার অপেক্ষা ফুরায় না, কারণ তাকে আর অপেক্ষা করতে হবে না। শুধু অপেক্ষা ফুরায়। ছোট্ট এক লাইনের একটা চিঠি। নামহীন, সম্বোধনহীন 'আমি এখানে নতুন করে সংসার শুরু করেছি। আর দেশে ফিরবো না। বশির।'[৩৩] অনেক যত্নে গড়া একটি সংসারের আকস্মিক ভাঙন সেলিনা হোসেনকে পীড়া দেয়।

ভাই-বোন হিসেবে নর-নারীর চিত্র

জন্ম থেকে একসঙ্গে নানা দুষ্টু-মিষ্টি ঝগড়া ঝাটি করে, কিন্তু একজন আরেকজনের অনুপস্থিতি মেনে নিতে পারে না; এমন সম্পর্কই ভাই-বোনের সম্পর্ক। আবাল্য তাদের মা-বাবার আদর স্নেহ, ভালোবাসা ভাগাভাগি করে সুখে দুঃখে একসঙ্গে বেড়ে ওঠা। অবুঝ মন কখনো মা-বাবার ভালবাসার ভাগ দিতেও কুণ্ঠিত হয়। সামনে থাকলে ঝগড়া আর দূরে গেলে তারই জন্য চোখের জল। নর-নারীর যত সম্পর্ক আছে তার মধ্যে মিষ্টি সম্পর্কের নাম হচ্ছে ভাই-বোন। সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে ভাই-বোন অনেক জায়গা জুড়ে উপস্থিত রয়েছে। 'দুই ভাইবোন মিলে ঝগড়া করা, একসাথে আম কুড়ানো, ডাঙ্গুলি খেলা, পাড়া বেড়ানো'[৩৪] করে কখনো মা-বাবার কাছে নালিশ করে মার খাওয়ানো ইত্যাদি করে দিন কাটিয়েছে। আজ সেই বোন নিপুর বিয়ে দশ বছরের আবুর 'ছোট হৃদয়টাকে তোলপাড় করে দিল।'[৩৫] ভাই-বোন নিজের হাতে মেরে আবার বুকে ঝাঁপিয়ে বিলাপ করতে পারে কিন্তু তাকে পর করে দিতে পারে না। পারে না তাকে ছেড়ে দূর থাকতে। *খেয়াঘাট* ছোটগল্পটি ভাই-বোনের চিরাচরিত সম্পর্কের যথার্থ উপস্থাপন। ভাই-বোনের মমতা অবিনশ্বর, চিরস্থায়ী। *কাকজ্যোৎস্না* ছোটগল্পে বাচ্চুর বড়ো আপার প্রতি যে প্রেম সে প্রেমের বাবার মৃত্যুটা কাম্য হলেও বড় আপার হাড়ভাঙ্গা খাটুনি সে সহ্য করতে পারে না। আটাশ বছরের যৌবনটাকে লুকিয়ে চাপাহাসি দিয়ে লুকিয়ে রেখে যে আপা তাদের সংসারের ঘানি টেনেই চলেছে, সেই সঙ্গে বৃদ্ধ বাবার অসুখের চিকিৎসা, ওষুধ, ফলের জুস ইত্যাদি যোগাতে আপুর যে নিরলস পরিশ্রম তা দেখে বাচ্চু ক্রমে আহত হয়। মাঝে মাঝে তার মনে হয় 'বাবা মরে

যাক-তার বদলে বড়ো আপা বাঁচুক পৃথিবীর সব রসটুকু চুষে নিয়ে, সব রোদ-আলো গায়ে মেখে একটা তাজা জীবনের স্বাদ নিয়ে।'[৩৬] বড়ো আপাকে সে এতটাই ভালবাসে। হৃদয়ের সমস্ত অনুভূতি দিয়ে সে তার বড়ো আপার সুখ চায়। তাইতো সে একদিন বলে 'বাবাকে বিষ দিয়ে মেরে ফেললে হয় না?'[৩৭] নিজের সর্বস্বটুকু দিয়ে ভাই বোনের জন্য এবং বোন ভাইয়ের জন্য পৃথিবীর সব সুখ কিনে নিতে চায়। এই ভাই বোনের সম্পর্ক কখনো রক্তের সম্পর্ককেও তুচ্ছ করে প্রতিষ্ঠা করে তাদের সম্পর্কের বাঁধন। সহোদর বা সহোদরা না হলেও দায়িত্ব কর্তব্যে কখনো ভাটা পড়ে না এই সম্পর্কে। এর উল্লেখযোগ্য উদাহরণ হলো *ভালবাসার আমতুতু চর* ছোটগল্পের জলিল চরিত্র। ছোটবেলা থেকে মামার সংসারে বড় হয়। নিজের পরিপূর্ণ জীবন-ধারণ মামার সংসার থেকে না পেলেও নিজের সর্বস্ব শেষ তিন কানি জমি দিয়ে মামাতো বোন ময়না যাকে সে বুবু বলে ডাকে তার সুখ কিনে নেয়। হাওলাদারের ছেলেকে নিজের তিন কানি জমি লিখে দিয়ে ময়না বুবুকে বিয়ে দেয় জলিল। যেখানে ময়নার নিজের বাবা কিছু করার ক্ষমতা থেকেও নিশ্চুপ। বরং জলিলের এই আত্মত্যাগকে মামা সাবধান করে দেয়।

একদিন মামা ডেকে বলে, জমি রেজিস্ট্রি করার আগে ভালো কইরা ভাইবা দ্যাখ জলিল।

-মুই আপনের মতো অত ভালো-মন্দ বুঝি না
-তিনকানি জমি কম না।
-আর ময়না 'বু? হের কথা ভাবেন না !
-কপালে থাইকলে একদিন বিয়া অইবো।
-ঐ কপাল লইয়া বইয়া থাইকলে ময়না 'বুর জীবন আন্ধার।[৩৮]

যেখানে নিজের বাবা নিজের এতটুকু সম্পত্তির বিনিময়ে মেয়ের সুখ কিনতে নারাজ সেখানে পাশে দাঁড়িয়েছে এক হতভাগা ভাই। ভাই-বোনের সম্পর্কে এমনই পবিত্রতা দিয়ে তৈরি করেছেন সেলিনা হোসেন। কিন্তু একটি পয়সার যেমন এপিঠ-ওপিঠ আছে, জগতে যেমন রাত-দিন আছে তেমনি ভাই-বোনের মধ্যেও আছে তিক্ত সম্পর্ক। স্বার্থের অন্ধতা ভাই-বোনের সম্পর্কেও নিয়ে আসে ব্যবধান। ইজ্জত ছোটগল্পে মালেকাকে তার স্বামী লতিফ গলা কেটে হত্যা করলেও ভাই জব্বার লতিফের প্রতি থাকে ম্রিয়মান। যেন বিয়ের সময় তার বোনের ভরণ পোষণের পাশাপাশি তাকে খুন করার অধিকারও দিয়ে দিয়েছে লতিফকে। অথচ, মালেকার অপরাধ যাচাই করার প্রয়োজন পড়েনি তাদের দৃষ্টিতে। নারী সে যেই হোক তার উপর একটি কলঙ্ক মিথ্যা হলেও যাচাই করার দায় পুরুষের ওপর বর্তায় না। বোনকে বিনা দোষে হত্যার প্রতিবাদ করা তো দূরের কথা 'আবদুল জব্বার সরোষে বলে, মরেছে বেঁচে গেছি আমরা। কিন্তু বংশের মুখে যে চুলকানি [চুনকালি] দিয়ে মরলো এটাই জ্বালা।'[৩৯] তাই নদীর জলে ভাসিয়ে দেওয়া বোনের দেহ নিয়ে এসে সৎকার করতে বাধে। পুরুষরা তাদের সমাজকে এতটাই ইজ্জতের সহিত ভিত্তি প্রস্তর দিয়ে সাজিয়েছে যে নারীর সম্পর্কে বাজে কথা শুনে যাচাই ছাড়া তাদের ছি ছি করতে যতটা না ইজ্জত হানিকর, একজন মানুষের মৃত্যুর পর জানাজা না করাটা তাদের কাছে ততটা ইজ্জত হানিকর নয়।

পিতা-কন্যা সম্পর্কের সূত্রে নর-নারী

সেলিনা হোসেন সম্পর্কের চিরায়ত রূপকে সাহিত্যের অবয়বে নিজস্ব চিন্তা চেতনায় ঢেলে সাজিয়েছেন। এরূপ ক্ষেত্রে তিনি সম্পর্কগুলোকে প্রয়োজনে নতুন করে সংজ্ঞায়ন করেছেন।

একজন পিতার অবদান শুধু সন্তানের জন্ম দেয়া এবং ভরণ-পোষণ দেয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। একজন পিতা হতে পারে তার কন্যার সবচেয়ে আস্থাশীল বন্ধু। সেলিনা হোসেন এমন পিতা-কন্যা সম্পর্ককে বন্ধুত্বের আদলে সাজিয়েছেন *গোলাপ ফোটা সকাল* ছোটগল্পে। ছোটবেলা থেকে বাবার কাছ থেকে একাধারে মা, বাবা এবং বন্ধুর সমস্ত ভালোবাসা নিয়ে বড় হয়েছে লেসিনা। 'মরা মাছের চোখের মত ফ্যাকাসে'[৪০] এবং 'চাষ দেয়া জমির মত অসমান'[৪১] রূপ নিয়েও আত্মমর্যাদা এবং জীবনের প্রতি পরম তৃপ্তি অনুভব করে লেসিনার বাবা। নিজের কুৎসিত রূপ তাকে ক্ষণের তরেও বিভ্রান্ত করতে পারেনি। তার মেয়ে লেসিনা গঠনগত এবং রূপ-সৌন্দর্যে তার বাবার উত্তরাধিকারী হলেও মেয়েকে তিনি শিক্ষার আলোয় আলোকিত করেছেন। বাবার মৃত্যুতে লেসিনার 'মনের যন্ত্রটাই বিকল অনুভূতিগুলো সব নিস্তব্ধ যেন তারা প্রিয়জনের মৃত্যুতে জানাজায় দাঁড়িয়েছে।'[৪২] পিতাবিহীন এ জীবন সংসার লেসিনার কাছে অনুভূতিহীন। পিতা-কন্যা সম্পর্কের রসায়ন অত্যন্ত ঘনীভূত। লেসিনার মতো *নতুন জলের শব্দ* ছোটগল্পে জমিলা আর মকবুল পাটোয়ারীর সম্পর্ক যেন এক নতুন স্পর্শের ঢেউ খেলানো অনুভূতি জাগায় জমিলার মনে। বাবার প্রতি অত্যধিক ভালোবাসা জমিলাকে সকল যন্ত্রণাকে সহ্য করার মন্ত্রণায় দীক্ষা দেয়। তাইতো কাজ থেকে ফিরে মকবুল পাটোয়ারী পান্তা খেতে চাইলে জমিলা নিজের জন্য না রেখে সকল পান্তা বাবার পাতে ঠেলে দেয়। হাভাতে সংসারে জমিলা ঘরে ভাত না থাকার কথাটা গোপন করে অবলীলায় বলে তার ক্ষিদে নেই। স্নেহাতুর বাবা হয়তো কম খেয়ে বা না খেয়ে মেয়েকে খেতে দেয় তাই জমিলার এ আয়োজন। ছেলেবেলা বাবা যেমন নিজের অন্নটুকু সন্তানের বুভুক্ষায় তুলে দেন তেমনি সুযোগ্য সন্তানও তার ব্যতিক্রম নয়। কিন্তু চতুর বাবা ভাত নেই বুঝতে পেরে 'ক্ষুধার যে তীব্রতা এতক্ষণ মাথায় আগুন জ্বালিয়েছিল তা দপ করে নিভে যায়। মনে হয় মেয়ের সামনে থেকে এখন পালিয়ে যেতে পারলেই বুঝি বাপ হওয়ার লজ্জাটা এড়ানো যায়।'[৪৩] সম্পর্ক যেখানে পবিত্র সেখানে সম্পর্কের উপস্থিতি এমনই হয়। যা সেলিনা হোসেন তুলে ধরেছেন নিখুঁতভাবে তাঁর ছোটগল্পগুলোতে।

মা হারা একমাত্র মেয়েকে বুকে আগলে বড় করেছেন দাদ আলী। সংসারে বাবা ও মেয়ে ঝোরা ছাড়া ওরা আর কেউ কারো নয়। ওদের চাওয়া পরস্পরের সুখ। দাদ আলীর এখন একমাত্র স্বপ্ন মেয়েকে সুপাত্রস্থ করে তার দায়িত্ব সম্পূর্ণ করা। নিজের সহায় সম্বল বলতে কিছু না থাকলেও নিজের হাড় মাংস ক্ষয় করে মেয়ের জন্য অতিরিক্ত পরিশ্রমে পয়সা সঞ্চয়ের মাধ্যমে মেয়েকে মহাসমারোহে বিয়ে দেয়ার স্বপ্ন লালন করে। মেয়ের সুন্দর ভবিষ্যৎ কল্পনায় দাদ আলীর পরিশ্রমকে পরিশ্রমই মনে হয় না। খুলনা পেপার মিলের জন্য কাঠ কেটে উপাদান সংগ্রহ করাই দাদ আলীর কাজ। প্রতি গাছ হিসেব করে পয়সা পায় বলে দাদ আলীর নিরন্তর চেষ্টা যেন বেশি করে গাছ কাটতে পারে। 'কেওড়া গাছের গুঁড়িতে যখন কুড়োলের এক একটা কোপ দেয়, তখন দাদ আলীর মনে হয় ঝোরার সুখের দিন তরান্বিত করছে ও।'[৪৪] এ ছোটগল্পে সেলিনা হোসেন শুধু বাবা হয়ে মেয়ের প্রতি দায়িত্বটুকুই বড় করে দেখাননি, দেখিয়েছেন মেয়েকে নিয়ে এক বাবার শখ আহ্লাদকে। বাবাকে কখনো সামর্থ্য দিয়ে বিচার করা যায় না। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দাদ আলী বেশ আড়ম্বর করেই দেবে। আর এ খরচ যোগাতেই তার এতো পরিশ্রম। দাদ আলী ভাবে-

> আসছে বোশেখে বিয়েটা দিয়ে দিবে। বোশেখের আর আট মাস বাকি। দাদ আলীর ইচ্ছে এই আট মাসে রাতদিন খেটে একটা মোটা অংকের টাকা জোগাড় করবে। লাপিসাপি করে মেয়ের বিয়ে দেয়ার ইচ্ছে তার নেই। যে বিয়েতে বাজনা বাজে না, বাতি জ্বলে না, ধুমধাম হয় না সেটা বিয়ে অনুষ্ঠান নয়। সে অনুষ্ঠান করবে লোক বয়ে নিয়ে যাবার মতো। একমাত্র মেয়ের বিয়ে দাদ আলী সাতদিন বাজি ফুটিয়ে, বাজনা বাজিয়ে দেবে, মনের আশ মিটিয়ে দেবে। ঝোরা তার স্বপ্নের কুঁড়ি।[৪৫]

পিতা কন্যা সম্পর্ক শুধু জন্ম, শাসন আর ভালোবাসায় সীমাবদ্ধ নয়। কন্যাকে নিয়ে পিতার মনে থাকে নানা স্বপ্ন। মেয়েকে সকলের নিকট শ্রেষ্ঠ রূপে তুলে ধরতে পিতার ভূমিকা থাকে অগ্রণী। কিন্তু সেই স্বপ্ন পূরণ ব্যাহত হলে চিরচেনা নমনীয় পিতাটি হয়ে উঠে নির্মম আর পশুর চেয়েও হিংস্র। নিজের বংশ মর্যাদা আর আভিজাত্যকে উপেক্ষা করে চাল চুলোহীন এক সাধারণ ছেলের সঙ্গে ঘর বাধার স্বপ্ন কাল হয়ে দাঁড়িয়েছে *স্রোত* ছোটগল্পের পারুলের। দীর্ঘদিন তক্কে তক্কে থেকে শেখ চাঁদ চুনুর সঙ্গে পালিয়ে যাওয়া মেয়ের সন্ধান করেন। তারপর পারুলের বাবা শেখ চাঁদ পারুলের ভালোবাসার শাস্তি দিয়েছে বেশ নৃশংসভাবে। তিনি চুনুকে মিথ্যে অভিযোগে জেলে পাঠিয়ে 'ধারালো দা দিয়ে টুকরো টুকরো করে নদীতে ফেলে দেয় পারুলকে।'[৪৬] নিজ তনয়াকে এমনভাবে বংশ মর্যাদা খর্ব করার শাস্তি বাংলা সাহিত্যে বিরল। যা সেলিনা হোসেন তুলে ধরেছেন নিরস বর্ণনায়। *বৈধব্য* ছোটগল্পে নুরু মুন্সীর কোনো অভাব না থাকলেও তার জ্যোতিষ বন্ধু ভোম্বলের কথায় তার মেয়ে আছিয়ার বৈধব্যের ভবিষ্যত বাণীতে যেন হতাশায় ভোগে। যে কোনো কিছুর বিনিময়ে মেয়ের সুখ চায় নুরু মুন্সী। তাই বন্ধু ভোম্বলের কথায় মেয়ের জন্য আংটি বানাতে তার বাঁশঝাড়ের একাংশ বিক্রি করে দিয়েও তার দুঃখ নেই। সেই আংটি মেয়ের অনামিকায় পরায়। তার মনে হয় 'ঝাড়ের বিনিময়ে ও তো আছিয়ার বৈধব্য ঠেকাচ্ছে'[৪৭] কিন্তু ভাগ্যের সঙ্গে মেয়ের জন্য সুখের লড়াইয়ে বাবা হেরে যায়। আংটি পরিয়ে মেয়েকে বৈধব্য থেকে মুক্তি দিতে পারেনি বাবা। *হৃদয় ও শ্রমের সংসার* ছোটগল্পে অন্য আরেক বাবা নিজের জমি প্রাপ্তির লোভে আঠারো বছরের কন্যাকে বুড়ো কাশেম খানের সঙ্গে বিয়ে দিতেও কুণ্ঠাবোধ করে না।

মাতা-পুত্রের ভূমিকায় নর-নারীর উপস্থিতি

নর-নারীর স্নেহের বাঁধনে গড়া সম্পর্ক হলো মাতা-পুত্র। বাংলাদেশের সমাজে প্রায় ক্ষেত্রেই পরিলক্ষিত হয় একজন নারী যখন সন্তান সম্ভবা হয় অথবা সন্তান বাসনা করে তখন তা প্রায় অধিকাংশ হয় পুত্র সন্তান বাসনা। তার প্রধান কারণ হচ্ছে নারীর অভিজ্ঞতা। একজন নারী নিজে নারী হয়েও সন্তান হিসেবে কন্যা সন্তানের তার কাছে মূল্য নেই। কারণ নারী নিজের জীবন দিয়ে বুঝেছে কন্যা সন্তান প্রসবের জ্বালা। একজন কন্যা হোক ম্যাজিস্ট্রেট কিংবা আয়া বিয়ের সময় তাকে যৌতুক দিতেই হবে। তাছাড়া মানুষ করতে সমাজের পরতে পরতে ওৎ পেতে থাকে নারীর জন্য নানা নিষেধাজ্ঞা আর প্রতি মুহূর্তে বিপদের হাতছানি। তাই অধিকাংশ মায়েরা কন্যা সন্তান প্রসব করতে ভীত-সন্ত্রস্ত থাকে। তবে পুরুষ সন্তান যেমন প্রত্যাশা থাকে আবার পুরুষ সন্তান হলে তার কদরেরও সীমা থাকে না। তাদের ধারণা পুরুষ সন্তান হলে তাদের ভবিষ্যৎ নিশ্চিন্ত হবে। শুধু একারণে নয় সন্তানের প্রতি মায়ের স্বাভাবিক অনুভূতি থেকে একজন মা সন্তানের কাছে আশা করে সেই সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। পুত্র সন্তান যখন জীবন

বিমুখ হয়ে পড়ে তখন সেই মায়ের চিন্তার অবধি থাকে না। চোখের সামনে ছেলের স্বাভাবিক জীবন দেখে যেতে চায় সব মা। তাই ছেলে সময় মত বিয়ে করে সংসারী না হলেও যেন মায়ের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়। মা সবসময় ভাবে তার মৃত্যুর পর বুঝি ছেলেকে আগলে রাখার মত কেউ থাকবে না। মায়ের এই শঙ্কা পেশ করে 'বাবা কইছিলাম কি মোর আর কয়দিন। আইজ আছি কাইল নাই। নাতিপুতি দেহার শখ অয় না মোর?'[৪৮] কিন্তু পুত্রেরা কখনো বুঝেনি মায়েদের হাহাকার। মা কখনো নিজেকে নিঃস্ব করে জীর্ণ অবস্থায় প্রত্যন্ত পরিবেশে কোনো রকম টিকে থাকলেও পুত্রকে ঢাকায় পাঠায় পড়াশোনা করে মানুষ হয়ে দেশ সেবা করার জন্য। একজন মা সহায় সম্বলহীনা হয়েও পুত্রকে নিয়ে স্বপ্ন দেখে। এমন দুঃসাহসিক স্বপ্ন দেখেছেন *জলহাওয়া* ছোটগল্পের দীনহীনা মা কসিরন বেওয়া। নিজে গ্রাম্য লতাপাতা সেদ্ধ করে জীবিকা নির্বাহ করলেও 'কসিরন বেওয়া আপন মনে বলে, ছেলেটা শহরে কী খায় কে জানে? ডিম, দুধ কি পায়?'[৪৯] শুধু এই চিন্তাই নয়। শত দুঃখ দারিদ্র্যের মধ্যেও ছেলে নেতা হবে জেনে নেতা কী জিনিস না জেনেই পুলক বোধ করে। তার প্রতিবেশিদের সঙ্গে গর্ব করে বলে 'জানিস বীথি আমার ছেলে নেতা হয়েছে।'[৫০] নারী যখন পুত্রকে মনের মত মানুষ করতে পারে তখন নারীর গর্বের সীমা হয় প্রসারিত। শুধু সামাজিক মান মর্যাদায় নয় মায়ের আত্মত্যাগে এক সাধারণ ছেলেও মায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতাবশত মায়ের কথাকেই শেষ কথা বলে মনে করে। যদি তা কোনো অন্যায় আচরণও হয়। *মতিজানের মেয়েরা* ছোটগল্পে মতিজান বিয়ের পর স্বামীর ব্যক্তিত্ব নিয়ে সংশয় হলে স্বামী মতিজানকে বলে 'হামাক কিছু কব্যা না। হামি কিছু জানি না। কিছু করব্যার প্যারমু না। মা-ই সব।'[৫১] আবার *ইজ্জত* ছোটগল্পে আবদুল জব্বারের বিয়ের পর বৌয়ের সংসারে মায়ের একমুঠো ভাতের ব্যবস্থা হয়নি। মাকে পাগল হয়ে ছেলের বৌয়ের ফেলে দেওয়া ভাতের ফেন থেকে খুটে খুটে ভাত খেয়ে বাঁচতে হয়। মা-ছেলে সম্পর্কটা যতটা হৃদ্যতার স্বামী-স্ত্রী সম্পর্কটা কম হৃদ্যতার নয়। কিন্তু সংসারে সকলের জায়গা সমান্তরাল। এক জনের জন্য অন্য এক জনের জায়গা কখনো বিচ্যুত হয় না।

সেলিনা হোসেনের ছোটগল্পে নর-নারীর চরিত্র বিশ্লেষণে পাওয়া যায় নৈসর্গিক চিন্তার প্রতিফলন। তাঁর চৈতন্যের নিভৃত প্রদেশ নিঃসৃত নির্যাস দিয়ে রাঙা তাঁর নর ও নারীরা। এখানে উন্মুক্ত চিন্তা ও ব্যক্তিত্বের উপস্থিতি লক্ষণীয় তাঁর প্রতিটি নর ও নারী চরিত্রে। তারা স্ব-স্ব জায়গায় আপন বৈশিষ্ট্যে প্রজ্বলিত। তিনি মার্ক্স এঙ্গেলসের সূত্রমতে নর-নারীর সম্পর্কের জটিল ধাঁধা বিশ্লেষণ করেছেন তাঁর অধিকাংশ ছোটগল্পে। পুরুষের কাছে নারীর সবচেয়ে উপভোগের বিষয়টি হলো তার দেহ। এ দেহ সম্ভোগের ঘূর্ণিপাকে নিজের জীবনের প্রতি তিক্ততা দেখা যায় *রতিবিলাস* গল্পের মিসেস খান, *মাস্টা* গল্পের সোহানী, *কান্নার তৃতীয় দিন* গল্পের জমিলা খাতুন প্রমুখ। তারা সকলেই তাদের স্বামীর কাছে শুধু দেহের জন্যই সম্মানিত হয়েছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে তারা কেউ তৃপ্ত হয়নি।

তবে দেহজ সম্পর্কের ঊর্ধ্বে গিয়েও নিজের মূল্যবোধের সন্ধান লাভ করেছে *বৈশাখী গান* গল্পের ইকতি, *উৎস থেকে নিরন্তর* গল্পের ওজুফা। ইকতি ও ওজুফা তাদের স্বামীর কাছে ব্যক্তিত্বের মূল্য পেয়েছে। পেয়েছে মানুষ হিসেবে অধিকারের স্বীকৃতি।

শুধু স্বামী-স্ত্রী নয়, ভাই-বোন, পিতা-কন্যা সম্পর্কেও নারীকে কম ঘূর্ণিপাকে পড়তে হয়নি। *কাকজ্যোৎস্না* গল্পে বাচ্চু তার বড় বোনের হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমে প্রতিনিয়ত আহত হয়েছে। অসুস্থ

বাবার চিকিৎসার জন্য তার বোন করেছে বিশ্রামহীন পরিশ্রম। বোনের একটু বিশ্রামের জন্য নিরবধি বাবার মৃত্যু কামনা করেছে সে। এমনকি বাবাকে বিষ দিয়ে মেরে ফেলার কথাও ভেবেছে গোপনে। সবই তার বোনের প্রতি ভলোবাসার আকুতি। *ভালবাসার আমতুতু চর* গল্পের জলিল বোনের প্রতি পরম মমতায় নিজের সর্বস্ব উজাড় করে দিয়েছে। মামার বাড়িতে ছেলেবেলা থেকে ময়না বু'কে নিজের আপন বুবুর মতই জেনে বড় হয়েছে সে। আজ তিনকানি জমির জন্য ময়না বু'র বিয়ে হবে না তা জলিল মেনে নিতে পারে না। তার মামা এ শর্তে মেয়ের বিয়েতে রাজি না হলেও জলিল জানে নারীর একাকীত্বের জীবনযন্ত্রণা। এ সকল নারী চরিত্র লেখক সেলিনা হোসেন বস্তুনিষ্ঠ জীবনদৃষ্টি দিয়ে এঁকেছেন নিপুন তুলির আঁচড়ে। আর ছোটগল্পকার হিসেবে লেখকের এখানেই সার্থকতা।

তথ্যসূচি:

---

১ মঈনুদ্দীন আহমদ, *নারী-পুরুষ সম্পর্ক ধর্ম ও মার্কসবাদ*, ঢাকা, শ্রাবণ প্রকাশনী ২০০৭, পৃ. ১৫

২ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পা), *চর্যাগীতিকা*, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, অগ্রহায়ণ ১৪০২, পৃ. ৬৫

৩ ইয়াহইয়া মান্নান, *আল মাহমুদের উপন্যাস বিষয় ও চিন্তা*, ঢাকা, প্রীতি প্রকাশন, ২০০৭, পৃ. ২১

৪ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পা), *চর্যাগীতিকা*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮৫

৫ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা (সম্পা), *বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্য*, স্টুডেন্ট ওয়েজ, আশ্বিন, ১৪০৭, পৃ. ৭১

৬ চন্দন আনোয়ার (সম্পা), *গল্পকথা*, সেলিনা হোসেন সংখ্যা, রাজশাহী, বর্ষ ৫, সংখ্যা ৬, ফেব্রুয়ারি, ২০১৫, পৃষ্ঠা. ১৫

৭ সেলিনা হোসেনের সাক্ষাৎকার, সাক্ষাৎকার গ্রহণ মোহাম্মদ জাকির হোসেন এবং নাজিয়া আফরিন, অপ্রকাশিত, সাক্ষাৎকার গ্রহণের তারিখ ১৯/০১/২০১৭

৮ মুহম্মদ আবদুল হাই ও আনোয়ার পাশা সম্পা, *কালকেতু উপাখ্যান*, ঢাকা, স্টুডেন্ট ওয়েজ, ষষ্ঠ সংস্করণ, ১৪০৭, পৃ. ৫১

৯ সেলিনা হোসেন, *গল্পসমগ্র*, সময় প্রকাশন, ঢাকা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ২০১০ পৃ. ১৮

১০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭

১৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গল্পগুচ্ছ*, তাজিন বইঘর, ২০০৪, পৃ. ৪১২

১৪ সেলিনা হোসেন, *গল্পসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৪

১৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৫

১৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯

১৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৯

১৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১

১৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

২০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩

২১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১১

২২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১০

২৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২

২৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১৩

২৫ পূরবী বসু, *আমার এ দেহখানি নারীর কথা: গল্পে ও রচনায়*, ঢাকা, বেঙ্গল পাবলিকেশন্স, ২০১৩, পৃ. ১৮১
২৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮১-১৮২
২৭ সেলিনা হোসেন, গল্পসমগ্র, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪০
২৮ আল্ বাহি আল্ খাওলি, *নারী ও পুরুষ ভুল করে কোথায়*, ঢাকা, পিস পাবলিকেশন, বাংলাবাজার, ২০১২, পৃ. ৯১
২৯ সেলিনা হোসেন, *গল্পসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৬
৩০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫১৫
৩১ সেলিনা হোসেন, *বুনো ফুলের মালা*, ঢাকা, সাহিত্য বিলাস, ২০০৯, পৃ. ১৫
৩২ মাসুদা সুলতানা রুমী, *নারী ও পুরুষ পরস্পরের বন্ধু ও অভিভাবক*, ঢাকা, আহসান পাবলিকেশন, দ্বিতীয় প্রকাশ, ২০১৩, পৃ. ৮
৩৩ সেলিনা হোসেন, *গল্পসমগ্র*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯
৩৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
৩৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪
৩৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৩
৩৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫
৩৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯
৩৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৮
৪০ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৪১ প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০
৪২ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯
৪৩ প্রাগুক্ত, পৃ. ১১২
৪৪ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
৪৫ প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩
৪৬ প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬
৪৭ প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৬
৪৮ প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬
৪৯ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৩
৫০ প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪
৫১ প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৩